অভিসরণ / ABHISARON
A Multilingual International Peer-Reviewed Research Journal
Volume 1, Issue II, July 2026, PP. 138-146
www.abhisaron.com
ISSN-3139-4027(Online)
DOI - https://dx.doi.org/10.67757/abhisaron.2026.v1i2.019

NAKSHAL ANDOLAN KENDRIK CHOTOGALPA : CHATRA ANDOLANER RUP O TATPARYA / নকশাল আন্দোলন কেন্দ্রিক ছোটোগল্প: ছাত্র আন্দোলনের রূপ ও তাৎপর্য

DIPEN MONDAL / দীপেন মন্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ, মেদিনীপুর কলেজ (অটোনমাস)
Email: dipenmondal614@gmail.com

Accepted: 07.07.2026
Published: 20.07.2026

Keywords:
বিপ্লবী চেতনা, রাষ্ট্রের দমননীতি, সহিংসতা, পরিবার ও ব্যক্তি জীবনের সংকট, আদর্শ ও বাস্তবতার দ্বন্দ্ব।

Abstract:
বাংলা সাহিত্যে রাজনীতি কেন্দ্রিক রচনা কম নয়। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময়ে ঘটে যাওয়া একাধিক রাজনৈতিক ঘটনা সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে। সাহিত্য সমাজের দর্পণ তাই সাহিত্যে সেইসময়ের রাজনৈতিক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের চিত্র ফুটে ওঠাই স্বাভাবিক। ভারতবর্ষে যে সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলন ঘটেছিল তাতে ছাত্রদের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। তারা যেমন স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ে বিভিন্ন আন্দোলনে যোগদান করে তাতে প্রাণ সঞ্চার করেছিল, ঠিক একইভাবে পরবর্তী সময়েও তারা বিভিন্ন আন্দোলনে যোগদান করে সেই আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করেছে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময় সাতের দশকের উল্লেখযোগ্য আন্দোলন ছিল নকশাল আন্দোলন। নকশাল আন্দোলনে গ্রাম থেকে শহরাঞ্চল সমগ্র অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই আন্দোলনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সেই সময়ে একাধিক ছাত্র এই আন্দোলনে যোগদান করে। এই ছাত্র শক্তি হয়ে ওঠে এই আন্দোলনের মূল শক্তি। মূলত তাদের হাত ধরেই এই আন্দোলন বৃহত্তর রূপ পায়। এই আন্দোলনে ছাত্রদের প্রকৃত স্বরূপ একাধিক ছোটোগল্পে ধরা পড়েছে।

Discussion:

'নকশাল' কেবল একটি শব্দ নয় এটি পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য পর্যায়। যেখানে নকশালবাড়ি নামক একটি ছোট্ট গ্রামকে কেন্দ্র করে কৃষকদের দ্বারা এই আন্দোলনের সূচনা হলেও পরবর্তী সময়ে তা বৃহত্তর রূপ ধারণ করে। শিক্ষিত সমাজের একাংশ এই আন্দোলনকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছিল। মার্কসবাদপন্থী সাম্যবাদে বিশ্বাসী বহু শিক্ষিত ছাত্র এই আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি ছিল। প্রথম পর্যায়ে চারু মজুমদার, কানু সান্যাল প্রমুখের দ্বারা এই আন্দোলন অগ্রসর হয়। এক সময় এই আন্দোলন তার মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার মতো ঘটনার মধ্য দিয়ে আন্দোলনকে কালিমালিপ্ত করতে থাকে। এই সময় আন্দোলন এতটাই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে সরকারের পক্ষে তা সামাল দেওয়া দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। তাই এই সময়কার সরকার এই ছাত্র আন্দোলনকে দমানোর জন্য সশস্ত্র পুলিশী অপারেশন চালান। যেখানে দেখা যায় পুলিশ এবং ছাত্র উভয়ের সংঘর্ষের কারণে দুই পক্ষেরই অনেকে প্রাণ হারিয়েছে। এমনকি আন্দোলনে যুক্ত নয় এমন অনেক ছাত্রও পুলিশের অত্যাচারে অত্যাচারিত হয়েছে। ভারতবর্ষে ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস অতি প্রাচীন এবং গৌরবময়। মূলত উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে ছাত্র আন্দোলনের সূচনা হয়। ছাত্র আন্দোলন একটি বহুল চর্চিত বিষয়। ভারতবর্ষের ছাত্র আন্দোলনের দুশো বছরের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় এর প্রথম দিকে ছিল সংস্কার মূলক এবং দ্বিতীয় পর্যায় ছিল গণ সংগ্রামমূলক। হিন্দু কলেজের তরুণ শিক্ষক ডিরোজিওর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে একদল ছাত্র, সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করার জন্য এগিয়ে আসে। পাশ্চাত্য ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে তারা ক্রমশ যুক্তিবাদী হয়ে ওঠে। এবং পরবর্তী সময়ে ইংরেজ প্রশাসনের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে তারা আন্দোলন মুখী হয়ে ওঠে। উনবিংশ শতকের ছাত্ররা বিভিন্ন মহাপুরুষ যেমন রামমোহন বিদ্যাসাগর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের সমাজ সংস্কারের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। সতীদাহ প্রথা, গঙ্গায় কন্যা বিসর্জন, বর্ণ বৈষম্য প্রভৃতি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। ছাত্র সমাজের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার প্রসারের ফলে তাদের মধ্যে যুক্তির প্রসার ঘটে। এই সময় তারা বিভিন্ন বিভিন্ন দেশের জাতীয় ভাবনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয় যেমন-ফরাসি বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা এই তিন মন্ত্রে মুগ্ধ হয় ফলে তাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার বিকাশ ঘটে। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের কারণে, ছাত্র যুবদের মধ্যে ইংরেজ অপশাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার উন্মেষ ঘটে। কিন্তু সেই সময় বিশেষ কোনো সংগঠন না থাকায় তা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তবে পরবর্তী সময়ে 'স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন' 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' এর মত ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্য দিয়ে তারা গণআন্দোলনে সচেষ্ট হয়।

জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে আলোচনা করলে দেখা যায় উনবিংশ শতকে শেষ এবং বিংশ শতকের প্রথমার্ধে ছাত্রদের মধ্যে সবথেকে বেশি জাতীয়তাবাদী ভাবধারার বিকাশ ঘটেছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের কারণে ভারতীয় তরুণ ছাত্র সমাজ ক্রমশ যুক্তিবাদী হয়ে ওঠে। ইংরেজ শোষণের কারণে ছাত্র যুবদের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হয়। ফলে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের সূচনা হয়। এই সময় বাংলার বড় লাট লর্ড কার্জন দমন মুলক নীতি গ্রহণ করেন তিনি বুঝতে পারেন ব্রিটিশ শাসন বিরোধী আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র বাংলা। তাই এই বাংলাকে দ্বিখন্ডিত করতে পারলেই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়বে। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে কার্জন বাংলাকে বিভক্ত করার প্রস্তাব রাখেন। এই বিভাজনকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে তীব্র বেদনা অনুভূত হয়। এই বেদনা থেকেই জাগ্রত হয় ক্ষোভ।তাই ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ কে কেন্দ্র করে আন্দোলনের সূচনা হয়। জাতীয়তাবাদী নেতারা এই আন্দোলনে গণ-আন্দোলনে পরিণত করতে ছাত্র সমাজকে আহ্বান জানান। বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্ররা

জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আন্দোলনে যোগদান করে। ক্রমে এই ছাত্ররাই হয়ে ওঠে আন্দোলনের মূল শক্তি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ এই সময় বিদেশি দ্রব্য বয়কটের ডাক দেয়। সেইডাকে সাড়া দিয়ে ছাত্র সংগঠন বিভিন্ন দোকানে বিদেশি দ্রব্য বর্জনের জন্য পিকেটিং শুরু করে। এমনকি কোন ছাত্র বিদেশি দ্রব্য ব্যবহার করলে তার উপর কড়া ব্যবস্থাও নেওয়া হতো। বিদেশি দ্রব্য ব্যবহার করা এতটাই বিপদজনক হয়ে পড়েছিল যে, স্কুল কলেজে বিদেশী বস্ত্র পরিধান করলে তাকে চরম অত্যাচারের মুখে পড়তে হতো। রিপন কলেজে কোন এক ছাত্র বিদেশি দ্রব্য পরিধান করায় তার সেই জামা ছিড়ে ফেলা হয়েছিল। এ আন্দোলনকে আরো তীব্র করতে ছাত্ররা ইংরেজি শিক্ষা এমনকি বিদেশি খাতাতে পরীক্ষা দিতেও অস্বীকার করে। এই ছাত্র আন্দোলনের ব্যাপকতা ব্রিটিশ শাসনের ভিতকে একেবারে নাড়িয়ে দেয়। আন্দোলনকে স্তিমিত করার জন্য সরকার দমনমূলক নীতি গ্রহণ করেন। ব্রিটিশ সরকার সেই পরিস্থিতিতে একটি সার্কুলার জারি করেন এবং সেই সার্কুলারের উল্লেখ করা হয় কোন ছাত্র এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত হলে তাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বিতাড়িত করা হবে। এমনকি তার সরকারি অনুদানও বন্ধু করা হবে। এই সার্কুলারের বিপরীতে তৈরি হয় এন্টি সার্কুলার সোসাইটি, যেখানে বিতাড়িত ছাত্রদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা করা হয়। বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষাপটে ছাত্র আন্দোলনের ঢেউ গোটা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল।

ভারতবর্ষে বিংশ শতকের শেষের দিকে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলেও সেই সময় কোনভাবেই তাদের দ্বারা সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা কথা উঠে আসেনি। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের নেতৃত্ব দানের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশার কথা উঠে আসে। ফলে জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলন গুলি সমাজের সমগ্র স্তরে ছড়িয়ে পড়ে। মহাত্মা গান্ধী অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল জালিয়ানওয়ালাবাগের নির্মম হত্যাকাণ্ড ও রাওলাট আইনের মতো অসম আইনের বিরোধিতা করা। এই আন্দোলন ছিল ছাত্র সমাজের কাছে এক চরম মুহূর্ত। গান্ধীজির ডাকে সাড়া দিয়ে স্কুল কলেজের হাজার হাজার ছাত্র সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে এবং ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থার উপর চরম আঘাত হানে। স্বদেশী ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা শহর ও গ্রামে ঘুরে ঘুরে মানুষকে স্বদেশীদ্রব্য গ্রহণ ও বিদেশী দ্রব্য বর্জন বিষয়ে প্রচার করতে থাকে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে চরকায় সুতো কাটার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করতে থাকে। অহিংসা পদ্ধতি অবলম্বন করে তারা বিদেশি দ্রব্যের দোকানগুলিতে পিকেটিং ও প্রতিবাদ মিছিল করতে থাকে। এই আন্দোলন ছাত্রদের মধ্যে প্রবল দেশপ্রেমের সঞ্চার ঘটায় ফলে তাদের মধ্যে আত্মত্যাগের ভাবনা জাগরিত হয়। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের পর গান্ধীজীর নেতৃত্বে ১৯৪২ এ শুরু হয় ভারত ছাড়ো আন্দোলন। গান্ধীজি সহ একাধিক শীর্ষস্থানীয় নেতা গ্রেপ্তার হওয়ার পর বিপ্লবীরা একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় ছাত্ররাই এই আন্দোলন সচল রাখে। গান্ধীজীর করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে হাজারো হাজারো ছাত্র এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই সময় তারা সম্মিলিতভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও থানার সামনে মিটিং মিছিল করতে থাকে। এমনকি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে কখনো পিকেটিং এবং কখনো ভাঙচুরের মতো কার্যকলাপও ঘটাতে থাকে। এই সময় তারা বিভিন্ন ব্রিটিশ বিরোধী লিফলেট ও পত্রিকা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে হস্তান্তর করার মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজও তারা করত। তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না করেই এই আন্দোলনে নিজেদেরকে সপে দিয়েছিল। অনেক সংগ্রাম ও লড়াইয়ের পর ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের পরেও মানুষ ব্রিটিশ শাসনের হাত থেকে মুক্তি লাভ করলেও জমিদারি শোষণের হাত থেকে মুক্তি পায়নি। এই জমিদারি শোষণের ফলে সাধারণ মানুষের মনে তীব্র খুব পুঞ্জিভূত হয়। বিংশ শতকের ছয়ের দশকে পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলার অন্তর্গত নকশালবাড়ি নামক স্থানে সাধারণ মানুষ জমিদারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী

হয়ে ওঠে। শুরু হয় জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন। গ্রামকে কেন্দ্র করে এই আন্দোলন শুরু হলেও পরবর্তী সময়ে এই আন্দোলনের আগুন শহরাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। যেহেতু নকশালবাড়ি নামক স্থান থেকে এই আন্দোলনের সূচনা তাই এই আন্দোলনের নাম হয় নকশালবাড়ি আন্দোলন। এ আন্দোলনের বীজ রোপিত হয়েছিল মূলত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা। তৎকালীন কমিউনিস্ট নেতা চারু মজুমদার কানু সান্যাল ও জঙ্গল সাঁওতালির নেতৃত্বে নকশালবাড়ির কৃষকরা একত্রিত হয়ে এ আন্দোলনের সূচনা করেন। সেই সময় স্কুল কলেজের ছাত্ররা এই আন্দোলনের দ্বারা দারুন ভাবে প্রভাবিত হয়। এর ফলে শিক্ষিত সমাজের একাংশ শ্রেণী বৈষম্য দূরীকরণের জন্য সোচ্চার হয়ে ওঠে। মূলত এই ছাত্ররাই ছিল আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি। প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মত কলকাতার নামিদামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা এই আন্দোলনে যোগদান করে। এই সমস্ত ছাত্ররা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে সাধারণ মানুষের অধিকারের কথা বোঝাতে থাকে। ছাত্ররা মাও সেতুং এর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কে বলিদান করে সশস্ত্র বিপ্লবে যোগদান করে। ভারতবর্ষের ছাত্র আন্দোলনের সুপ্রাচীন ইতিহাস সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি ধারায় বেশ সুনিপুণভাবে ধরা পড়েছে। একাধিক সাহিত্যিক তাদের রচনায় ছাত্রদের আত্ম বলিদানের এর কথা বলেছেন। তারা পাঠকের সামনে বিভিন্ন আন্দোলনে তাদের বীর বিপ্লব গাথা তুলে ধরেছেন। নকশাল আন্দোলন কেন্দ্রিক একাধিক গল্পে ছাত্র আত্ম বলিদান এর কথা জানা যায়। প্রবল আদর্শবাদ আদর্শ ও বাস্তবতার চরণদ্বন্দ্ব শ্রেণি বৈষম্য দূরীকরণ ও বিপ্লবের ফলে পুলিশ কর্তৃক চরম অত্যাচার প্রভৃতি বিষয় আন্দোলন কেন্দ্রিক গল্পগুলিতে ধরা পড়েছে।

নকশাল আন্দোলনের সময় মার্কসবাদের দ্বারা ছাত্ররা উদ্বুদ্ধ হলেও পরবর্তী সময়ে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য তৈরি হয়। ফলে এই মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙে গিয়ে অনেকগুলি দল সৃষ্টি হয় । এই দলগুলির মধ্যে ক্রমাগত সংঘাত লেগেই থাকতো। এই সংঘাতের চিত্রই ধরা পড়েছে সমরেশ বসুর লেখা ‘শহিদের মা’ গল্পে। গল্পে দেখা এক মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহিণী বিমলা। এই পরিবারে রয়েছে তার স্বামী ও তিন সন্তান। বড় ছেলে কৃপাল, মেজো ছেলে দয়াল এবং ছোট ছেলেটির নাম বাদল। পরিবারে বিমলার স্বামীসহ তার তিন ছেলে পৃথক পৃথক পার্টির দলের সঙ্গে যুক্ত। প্রথমদিকে ছোট ছেলে দয়াল কোন পার্টির সঙ্গে যুক্ত না হলেও পরবর্তী সময়ে বামপন্থী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সে একটি দলের সঙ্গে যুক্ত হয়। নাবালক অবস্থায় বাদল কোন পার্টির সঙ্গে যুক্ত না থাকায় বাড়ির দুই দাদা ও বাবার সঙ্গে ভালোই সম্পর্ক ছিল। পরবর্তী সময়ে ছাত্র জীবনে এই পার্টি করাকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয় এমনকি কথোপকথন বন্ধ হয়ে যায়। বিমলার দুই ছেলে ওপার বাংলা তে জন্মগ্রহণ করলেও বাদল জন্মেছিল এপার বাংলায় এক ঘোর বাদলের দিনে। তাই তার মা শখ করে নাম রেখেছিল বাদল। কিন্তু এই বাদল যখন আঠেরো বছর বয়সে পা দেয় তখনই তাকে অন্য পার্টির হাতে খুন হতে হয়। যেদিন বাদল খুন হয়েছিল সেদিন একমাত্র তার দলের ছেলেরাই তাকে শ্মশানে নিয়ে গিয়েছিল। তার দলের লোকেরা তাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময় একবারও হরিবোল ধনী দেয়নি স্লোগান দিয়েছিল ‘কমরেড বাদল জিন্দাবাদ’, ‘খুন কা বদলা খুন’। বাদলের পিতা হরপ্রসাদ সহ তার দুই দাদা একবারের জন্যেও শ্মশানে যায়নি। বাদলের মৃত্যুর দুদিন পরেই পশ্চিম দিকে রাস্তার মোড়ে তার পার্টি ছেলেরা বাদলের জন্য একটা শহীদ বেদী তৈরি করে। তার পার্টির লোকেরা বিমলাকে বাদলের শহীদ বেদীর কাছে নিয়ে যায় এবং সেখানে বিমলা দেখতে পাই —

‘পনেরো ষোলটা ইট ধাপে ধাপে সাজিয়ে চুনসুরকি দিয়ে গাধা হয়েছিল চুন দিয়ে লেপে সাদা বেদির গায়ে বাদলের নাম লেখা হয়েছিল। বিমলাকে ঘিরে বাদলের পার্টি ছেলেরা সেই একই স্লোগান দিয়েছিল কমরেড বাদল জিন্দাবাদ। খুন কা বাদলা খুন .....।’ [১]

নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত এই গল্পে মধ্যবিত্ত পরিবারের এক মায়ের অকালে সন্তান হারানোর জীবন যন্ত্রণার চিত্র ধরা পড়েছে। ছাত্র জীবনে রাজনীতি ও মতাদর্শগত বিরোধ এবং তাকে কেন্দ্র করে খুন জখমের কথা এ গল্পের মূল উপজীব্য বিষয়। নকশাল আন্দোলনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে হাজার হাজার মেধাবী ছাত্র নিজের ভবিষ্যতকে বলিদান দিয়ে এই আন্দোলনে সামিল হয়। প্রথমদিকে এ আন্দোলন অহিংস থাকলেও পরবর্তী সময়ে সহিংস আকার ধারণ করে। এই সমস্ত ছাত্ররা জমিদারদের ওপর চড়াও হয় এমনকি তাদের খুনও করে। এই আন্দোলনকে দমানোর জন্য তৎকালীন সরকার সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করেন। এমনকি কঠিন পরিস্থিতিতে তাদের উপর গুলি বর্ষণের আদেশ দেয়। এই রূপ প্রেক্ষাপট নিয়ে রচিত জয়ন্ত জোয়ারদারের 'জয় পরাজয়' গল্পটি। গল্পের সূচনাতে দেখা যায় সাধন নিখিলেশ সহ আরো কয়েকজন ছাত্র ইউনিভার্সিটির হোস্টেলের গেটের কাছে আড্ডা দিচ্ছে। তাদের কথোপকথন এর মধ্যে উঠে আসে ইউনিভার্সিটি সামনে ট্রাফিক পুলিশের মৃত্যুর কথা। মূলত এই ঘটনা আন্দোলনকারীদের হাতেই ঘটেছে। এই সময় কলকাতা রাস্তায় বারুদের গন্ধ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যেত না। আড্ডার মাঝখানে ছাত্রদের মধ্যে সাধন লক্ষ্য করে অনতিদুরে হোস্টেলের দিকে কিছু ভ্যান অন্ধকারের মধ্যে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এমতাবস্থায় হোস্টেলের মধ্যে অধিকাংশ ছাত্রই গা এলিয়ে গল্পে ব্যস্ত ছিল কিন্তু ঝড়ের গতিতে নিখিলেশ এসে বাইরের সমস্ত ঘটনা জানায়। ঠিক সেই সময় হোস্টেলের ছাত্র নেতা শ্যামল এবং তার কিছু অনুগামী মিটিং সেরে সিঁড়ি দিয়ে নামছিল। ছাত্রনেতা শ্যামল জানতো পুলিশ খতমের ঘটনা মানেই রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর আঘাত হানা এবং তারই প্রতিশোধ নিতে পুলিশ সমগ্র হোস্টেল ঘেরাও করে ফেলে। এমতাবস্থায় শ্যামল বিচলিত হয়ে ওঠে সে ঠিক কি করবে ভেবে উঠতে পারে না। টেলিফোনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় তার মাথার উপরে থাকা কোন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সে যোগাযোগ করতে পারেনা। তাই হোস্টেলের পাঁচশো জন ছেলের জীবন এখন তারই হাতে। এই কঠিন পরিস্থিতিতে শ্যামল তার কয়েকটি বন্ধুকে পাশে পায়। এবং বক্তৃতার মাধ্যমে হোস্টেলের সকলের মধ্যে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার লড়াইয়ে শামিল করতে সফল হয়।

'আর্মির গাড়ি ধীরে ধীরে হোস্টেলের মেন গেটে উপস্থিত হয়। ছাত্ররাও বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করার জন্য গোলাবারুদ নিয়ে প্রস্তুত হতে শুরু করে। শুরু হয় দুই পক্ষের এক অসম সাহসী লড়াই। দেখা যায়, —

'মেন গেট দিয়ে ফায়ার করতে করতে এক দঙ্গল সি আর পি ঢুকতে শুরু করে। সি ব্লক থেকে জ্যোতিদের দলটা ঝবঝব ইট মারে। যেন শিলাবৃষ্টি। সি আর পি এলোপাথাড়ি গুলি ছোঁড়ে। ঝন ঝন শব্দে জানালার কাচ ভাঙে।'[২]

শ্যামল জানতো কোনভাবে সে এই রাতটা সি আর পি দের আটকাতে পারলে পরের দিন শীর্ষ স্থানীয় নেতাদের সাহায্য পাবে। কিন্তু ক্রমেই গোলাবারুদ ফুরিয়ে আসে। তাই তাদের হার একপ্রকার নিশ্চিত হয়ে আসে। তবুও তারা শেষ চেষ্টা করতে ছাড়ে না। শ্যামল তার কয়েকজন অনুগামীদের সঙ্গে নিয়ে বাকিদেরকে দোতলা এবং তিন তালার রুমে ঢোকার আদেশ দেয়। কিন্তু হোস্টেলের সমস্ত ছাত্র পরার্থপরতার পরিচয় দিয়ে তার সঙ্গে সামিল হয়। দেখা যায় ভারী ভারী আরো কিছু ট্যাঙ্কার মেনগেট দিয়ে হোস্টেলের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেছে। ঠিক সেই সময় সজল তার পাইপ গানটা দিয়ে প্রথম গাড়িটার টায়ার ফাটিয়ে দেয়। তখনই গাড়ি থেকে ঝাঁক ঝাঁক সি আর পি এফ নেমে সমগ্র হোস্টেল ঘিরে নেয়। এবং সজল সহ সকলকে তারা ছাদ থেকে গ্রেফতার করে। কিন্তু তাদেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়ার সময় যখন ছাত্ররা স্লোগান দিতে শুরু করে তখন মনে হয় তারা কোনমতেই যুদ্ধে পরাজিত হয়নি। ১৯৬৭ সালে সূচিত নকশাল আন্দোলনের দ্বারা ছাত্র যুব দারুণভাবে প্রভাবিত হয়। শ্রেণী বৈষম্য দূরীকরণের জন্য তারা একসময় সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। তাই তারা হত্যা লীলায় মেতে ওঠে। ঠিক এই পরিস্থিতিতে সরকার এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিকে সামাল দেওয়ার জন্য দমনমূলক নীতি

গ্রহণ করে। এরই ফলে শুরু হয় রাষ্ট্র ও ছাত্র আদর্শের দ্বন্দ্ব। মূলত এই গল্পে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। নকশাল আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি ছিল ছাত্ররা। এই ছাত্রদের হাত ধরেই আন্দোলন সামান্য নকশালবাড়ি থেকে সমগ্র পশ্চিমবাংলা এবং পরবর্তী সময়ে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। তদানীন্তন সরকার এই আন্দোলনকে দমানোর জন্য ছাত্র সমাজের উপর আঘাত হানে। কিন্তু এত কিছু করেও তাদের দমানো যায়নি। কলকাতার প্রায় বেশিরভাগ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেধাবী ছাত্ররা এই আন্দোলনে যোগদান করে। এই সময় সরকার কোন ছাত্রকে সন্দেহের চোখে দেখলেই কোনর রূপ প্রমাণ ছাড়াই তাকে গ্রেফতার করত। এমনই এক চিত্র দেখতে পাওয়া যায় প্রলয় সেন এর লেখা 'তবু চলে যাচ্ছে' গল্পে। তপু এক মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। তার বাবা পেশায় একজন শিক্ষক। তপু একজন সাধারন ছেলে হওয়া সত্ত্বেও পুলিশী নির্যাতন থেকে রক্ষা পায়নি। কাল রাতে তপুদের পাড়ায় কোন এক বিপ্লবী কার্যকলাপ দেখতে পাওয়া যায়। যার কারণে পুলিশ তাদের পাড়ার প্রত্যেকের বাড়িতে খানা তল্লাশি শুরু করে। এই পরিস্থিতিতে পুলিশ কোন বাড়িতে তরুণ যুবকদের দেখতে পেলে বিনা অপরাধেই গ্রেপ্তার করতে থাকে।

'উমা জানে তপু কখনও বাইরের সাথে পাঁচে থাকে না। লেখাপড়া আর অবসর সময়ে ছবি আঁকা ছাড়া ওর আর তৃতীয় কোনও বাতিক নেই। তপুকে নিয়ে ভ্যানে তুলবার আগে সে কথা একবার শেফালী পুলিশকে স্মরণ করিয়ে দিতে সচেষ্ট হয়েছিল। পুলিশের লোক উত্তরে বলেছেন,এখন এসব কথায় কোন লাভ হবে না। উপরওয়ালার হুকুমে এসেছি কাল থানায় আসুন আগে ওকে আমরা ক্রস করি। তারপর ভালো বুঝলে নিশ্চয়ই ছেড়ে দেব।'[৩]

এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট সেই সময়ে ছাত্র যুবদের অবস্থা ছিল চরমসংকটাপন্ন। বেশিরভাগ বাবা-মা চাইতো তার সন্তান কোনোভাবেই যেন এই আন্দোলনের মধ্যে জড়িয়ে প্রাণ না হারায়। সেই জন্য বেশিরভাগ পিতা-মাতায় তার সন্তানকে কলকাতার বাইরে পাঠিয়ে দিতেন। এই গল্পের মধ্যেও সেই চিত্র ধরা পড়েছে। তপু অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমলেও তাকে তার মা ঘুম থেকে তুলে না কেননা আজ রাত্রেই জেগে তাকে ট্রেনে করে অনেক দূর পাড়ি দিতে হবে। এই কঠিন পরিস্থিতিতে শেফালির মন না চাইলেও তপুকে বাড়ির বাইরে পাঠাতে হয়। তাই তোপুর বিদায়ের দিন শেফালীর দুই চোখ বেয়ে শ্রাবণের ধারার মতো অশ্রু প্লাবিত হতে থাকে। গতকালের বিস্ফোরণের জন্য সেনাবাহিনীর গাড়ি বারবার পাড়াটা টহল দিয়ে যাচ্ছিল। সেনাবাহিনীর গাড়ি দেখলেই যেন পাড়ার ছেলেদের রক্তচাপ বেড়ে যায়। তপুকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর তার মধ্যে প্রাণোচ্ছল ভাব একেবারে হারিয়ে গেছে। থানা থেকে ফেরার পর থেকেই সে কেমন গুম হয়ে রয়েছে। তাই তার দিদি শেফালি তার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতে ভয় পায়। সন্তানের হৃদয়ের কথা একমাত্র তার জন্মদাত্রী মা-ই জানতে পারে। শেফালিও জানত তপু নিরপরাধ। কিন্তু তাকে পুলিশের শাসন এবং শোষণ থেকে মুক্ত রাখতেই তাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। অভিনাশের মা দাক্ষায়নী তপুর চলে যাওয়ার খবর শুনে বলে পুলিশের শোষণের সঙ্গে তপুর চলে যাওয়ার কোন সম্পর্ক নেই কারণ সে নির অপরাধ। কিন্তু এ সত্যতা সত্ত্বেও অবিনাশ তার ছেলেকে ছাত্র রাজনীতি থেকে দূরে দেখার জন্য তপুকে শহরের বাইরে পাঠিয়ে দেয়। এই গল্পের মধ্যে নকশাল প্রেক্ষাপটের ছাত্র রাজনীতি এবং পুলিশি শোষণের দিকটি স্পষ্ট।

নকশাল আন্দোলনের সময় শহরাঞ্চলের অনেক ছাত্র আন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য শহর ছেড়ে গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হয়ে। সেখানে তারা নেতৃত্ব প্রদান করতে থাকে এবং গ্রামের মানুষকে একত্রিত করে আন্দোলনকে আরো জোরালো করে তোলে। ঠিক এমনই বিষয় ধরা পড়েছে মানবেন্দ্র পালের 'অভিনয়' গল্পে। গল্পের সূচনাতে দেখা যায় মহাকুমার শহরের এক বিখ্যাত ব্যবসাদার ভবের মজুমদার কিন্তু

তিনি ব্যবসাদার হলেও সংস্কৃতি সম্পন্ন মানুষ। এমনকি তার স্ত্রীও সংস্কৃতিবান। বর্তমানে ভবের মজুমদার খুব বিরক্ত হয়ে ওঠেন। মূলত এর পিছনে কারণ ছিল নকশাল আন্দোলন। এই আন্দোলনের প্রভাবে মফস্বল এলাকাতেও স্কুল কলেজ বন্ধ পরীক্ষা-টরীক্ষা বন্ধ হয়ে পড়েছে। দেয়াল জুড়ে বিভিন্ন রকমের পোস্টার কোথাও লেখা 'গলাকাটা' 'বদলা' 'লাল সালাম'ইত্যাদি। ভবেন্দু মজুমদার চায়ের পেয়ালা হাতে খবর পড়তে পড়তে চটে যান। কাগজে খুনোখুনির রাজনীতির খবর পড়ে তিনি উত্তপ্ত হয়ে ওঠেন। তিনি মনে করেন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে এবং পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার কারণেই স্কুল কলেজের ছাত্রদের এত বাড়াবাড়ি। ঠিক করেন রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে 'চিরকুমার সভা' নাটক মঞ্চস্থ করবেন। নাটক রিহার্সালের মাঝে একজন পিয়ন একটি রেজিস্ট্রি নিয়ে উপস্থিত হয়। কিন্তু তাকে দেখে সবাই হতবাক হয়ে ওঠে। আসলে এই পিয়ন ছিল মহাদেব সাঁতরা, যে কিনা বিপ্লবী অনিলের বাবা। ভবেন্দু মুখে মহাদেব সাঁতরার কথা শুনে তার স্ত্রী মহাদেব সাঁতরার অবস্থার কথা জানতে চায়। কিন্তু ভবেন্দু জানায় মহাদেব কে দেখে মনে হয় যেন কিছুই হয়নি। তবে এ কথা মেনে নেওয়া যায় না কারণ দেশ শুদ্ধ লোক জানে তার ছেলে অনিল একজন বিপ্লবী এবং পুলিশের গুলিতে তার প্রাণ গেছে। মহাদেবের স্ত্রী প্রতিদিন সন্ধ্যা বেলায় রামায়ণ শুনতে যায়। সেখানে ভবেন্দ্র স্ত্রী তাকে গদগদ ভক্তিতে ঢলে পড়তে দেখে একবারও মনে করতে পারেননি, যে তার ছেলে মারা গেছে। ভবেন্দু একজন সংস্কৃতিবান মানুষ তাই তিনি কোনভাবেই পুলিশি ঝামেলার মধ্যে জড়াতে চান না। তাই দেখা যায় রবীন্দ্র মহোৎসব উপলক্ষ্যে তিনি পুলিশ অফিসারদের কার্ড দিয়ে আমন্ত্রণ জানাতে চায়। আসলে ভবেন্দু বাবুরা সমাজের বিশেষ স্বার্থপর মানুষের প্রতিনিধি। যারা যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করে শুধুমাত্র নিজের কথায় ভেবে গেছে।ভবেন্দু সহ পাড়ার সকলের চোখে মহাদেবকে নিয়ে সন্দেহের চিহ্ন দেখা দিয়েছে। তার কারণ কদিন আগেই প্রায় রাত দুটো নাগাদ একটা বিস্ফোরণে সমস্ত শহর কেঁপে উঠেছিল। সকালে এই ঘটনার সত্য খবর ছড়িয়ে পড়ে। জানা যায় একটি বাড়িতে কয়েকজন মিলে বোম বাঁধছিল এবং সেই বোমের বিস্ফোরণে বাড়ির ছাদ সহ জানালা দরজা সব উড়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, যারা বোম বাঁধছিল ছিল তাদের মধ্যে একজন মারা গিয়েছে এবং বাকিরা কোনক্রমে প্রাণে বেঁচে গেছে। কিন্তু ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যেই দলের লোকেরা সমস্ত তথ্য লোপাট করার জন্য সেখান থেকে সবকিছু সরিয়ে দেয়। এমনকি আহতদেরকে ডাক্তারি করানোর জন্য শহরের বাইরে নিয়ে যায় যাতে করে কোনোভাবেই তারা ধরা না পড়ে। আসলে নকশাল আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে সংগঠিত আন্দোলন হিসেবে গড়ে উঠলো পরবর্তী সময়ে দলীয় সদস্যদের মধ্যে মতপার্থক্যের কারণে তারা বিভক্ত হয়ে যায়। গড়ে ওঠে ছোট ছোট দল। এই দলগুলি প্রায় সই নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকতো। নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত এই গল্পে সেই সময়ের ছাত্র আন্দোলন এবং খুন জখম ও হতাশার চিত্র দারুন ভাবে ধরা পড়েছে। তাই দেখা যায়, –

'ভোর বেলায় দেখা গেল শহর থেকে মাইল খানেক দূরে একটা বাড়ির ছাদ উড়ে গেছে। দরজা জানলা ছিটকে পড়েছে রাস্তায়।

বোঝা গেল ফাঁকা বাড়ি পেয়ে এর ভেতরে বোমা বাঁধা হচ্ছিল অসাবধানতায় এই দুর্ঘটনা।

কিন্তু আসামিরা? নিশ্চয়ই দু-একজনের কাজ নয় তারা গেল কোথায়? অক্ষত অবস্থায় পালিয়ে গেছে? সম্ভবত। কেননা মেঝেতে দেয়ালের চাপ চাপ রক্ত তখনও তাজা।

বোঝা গেল দলের আর সব বা পাড়া-প্রতিবেশী রাতারাতি হতাহতদের সরিয়ে ফেলেছে।'[৪]

এই ঘটনার দুইদিন পর খবর ছড়িয়ে পড়ে পাড়ার ছেলে অনিল এই বিস্ফোরণে মারা গেছে। আবার কেউ কেউ বলে সে এখনো পর্যন্ত মারা যায়নি এখনো পর্যন্ত মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। আসলে অনিল ছিল পাড়ার সেই দাপুটে ছেলে যে কিনা দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার লিখতো আন্দোলনের সামনে নেতৃত্ব দিয়ে স্লোগান দিত। এই মৃত্যু সত্য হলে পুলিশের সম্পূর্ণ রোশ গিয়ে পড়বে অনিলের বাবা-মায়ের উপর। তাই দেখা যায় অনিলের মৃত্যুর

কথা শুনেও তার বাবা-মা একবারের জন্য বিচলিত হয়নি। প্রতিবেশীরা তাদের সন্তানের কথা জানতে চাইলে তারা জানায় অনিল কলকাতায় বেড়াতে গিয়েছে। ছেলের মৃত্যুর কথা জানা সত্ত্বেও পুলিশি শোষণ ও সামাজিক কুৎসার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অনিলের বাবা-মা স্বাভাবিক থাকেন। সকলের সামনে তারা স্বাভাবিক থাকলেও রাত্রে দেখা যায় মহাদেবের বুকে মাথা রেখে তার স্ত্রী একরাশ কান্নায় ভেঙে পড়েছে। আসলে তৎকালীন সময়ে এই ছিল সমাজের চিত্র। যেখানে শ্রেণী বৈষম্যের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন অতিপ্রয়োজনীয় হলেও সমাজের একাংশ আন্দোলনকারীদেরকে ঘৃণার চোখে দেখতো। এমনকি তাদের পরিবার থেকেও দূরে থাকার চেষ্টা করত। এই গল্পে সে কথাই ধরা পড়েছে।

এইভাবে নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত গল্প গুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ছাত্র রাজনীতির স্পষ্ট চিত্র। সাম্যবাদী আদর্শ, কৃষক ও শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা এবং সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের রোমান্টিক ও বিপ্লবী আবেদন গল্পগুলিতে গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু কেবলমাত্র রোমান্টিকতা নয় তার পাশাপাশি আদর্শ চ্যুত হওয়ার জন্য তীব্র বেদনা এবং আন্দোলনের অভ্যন্তরীণ গোলযোগ প্রভৃতি এই গল্পের মূল উপজীব্য বিষয় হয়ে উঠেছে। তাই এই গল্পগুলিকে সেই সময়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক দলিল বলা যেতে পারে।

Referance:

1. বিজিত ঘোষ সম্পাদিত'নকশাল আন্দোলনের গল্প, পুনশ্চ, ১১ এন ডাঃ এস সি ব্যানার্জি রোড, কলকাতা ৭০০০১০, পৃষ্ঠা-৩৫
2. সাধন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদনা, নকশালবাড়ির গল্প, গাঙচিল, দ্বিতীয় মুদ্রণ মে ২০২২, কলকাতা ৭০০১১১, পৃষ্ঠা-২৭৬
3. বিজিত ঘোষ সম্পাদিত'নকশাল আন্দোলনের গল্প, পুনশ্চ, ১১ এন ডাঃ এস সি ব্যানার্জি রোড, কলকাতা ৭০০০১০, পৃষ্ঠা- ১৩৭
4. সাধন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদনা, নকশালবাড়ির গল্প, গাঙচিল, দ্বিতীয় মুদ্রণ মে ২০২২, কলকাতা ৭০০১১১, পৃষ্ঠা-১১৪

Bibliography:

1. গৌতম চট্টোপাধ্যায়-স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের ছাত্র সমাজ, মণীশ গ্রন্থালয় প্রা.লি, ১৯৯০
2. নলিনী মোহন দাশগুপ্ত- রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি কথা, পঃবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৮৮৯
3. বরুণ দে (সম্পাদনা)-মুক্তি সংগ্রামে বাঙলার ছাত্র সমাজ, পঃবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা, ২০০৮
4. বিজিত ঘোষ সম্পাদিত'নকশাল আন্দোলনের গল্প, পুনশ্চ, ১১ এন ডাঃ এস সি ব্যানার্জি রোড, কলকাতা ৭০০০১০
5. সাধন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদনা, নকশালবাড়ির গল্প, গাঙচিল, দ্বিতীয় মুদ্রণ মে ২০২২, কলকাতা ৭০০১১১

.

6. সুপ্রকাশ রায়- ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন, কলকাতা, ২০০৯

7. সুশোভন সরকার- বাংলার রেনেসাঁস, দীপায়ন, কলকাতা, ২০১১
8. হীরেন দাশগুপ্ত ও হরিনারায়ণ অধিকারী-ভারতীয় উপমহাদেশের ছাত্র আন্দোলন, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন, কলকাতা, ২০০৮